পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতি

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে আধ্যাত্মিকতার বা তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিক চেতনাকেই ভাষান্তরে বলা হয়েছে অরূপানুভূতি। এই অরূপানুভূতি বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে তা বিস্তৃত ব্যাখ্যার বিষয়। সেই বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমরা তার একটি রূপরেখা এই আলোচনায় তুলে ধরতে চাই।

এই আলোচনার অন্তর্গত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন অথবা প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে :

ক) রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনা বা অরূপানুভূতির উৎস ও পারিপার্শ্বিকতা

খ) ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনা

গ) ঈশ্বর বা অরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনা

ঘ) রবীন্দ্রকাব্যে প্রকাশিত অরূপানুভূতির নির্বাচিত দৃষ্টান্ত

ঙ) রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির পর্যালোচনা

এখন এই প্রসঙ্গগুলি সামনে রেখে পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির স্বরূপ আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকচেতনা বা অরূপানুভূতির উৎস ও পারিপার্শ্বিকতা :-

রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে যে পারিবারিক আবহাওয়ার মধ্যে জন্মেছিলেন সেই আবহাওয়াই তাঁর অরূপানুভূতির উৎস। এ বিষয়ে তাঁর নিজের প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল :

১। 'আমাদের পরিবারে আমার জীবনরচনার যে ভূমিকা ছিল তাকে অনুধাবন করে দেখতে হবে। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমাদের সমাজের যে সকল প্রথার মধ্যে অর্থের চেয়ে অভ্যাস প্রবল তার গতায়ু অতীতের প্রাচীর বেষ্টন ছিল না আমাদের ঘরের চারিদিকে। বাড়িতে পূর্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত পূজার দালান শূন্য পড়ে ছিল, তার ব্যবহার পদ্ধতির অভিজ্ঞতা মাত্র আমার ছিল না। সাম্প্রদায়িক গুহাচর যে - সকল অনুকল্পনা, যে সমস্ত কৃত্রিম আচার বিচার মানুষের বুদ্ধিকে বিজড়িত করে আছে, বহু শতাব্দী জুড়ে নানা স্থানে নানা অদ্ভুত আকারে এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির দুর্বারতম বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা ও তিরস্কৃতির লাঞ্ছনাকে যজ্ঞাগত অন্ধসংস্কারে পরিণত করে তুলেছে, মধ্যযুগের অবসানে যার প্রভাব সমস্ত সভ্যদেশ থেকে হয় সরে গিয়েছে নয় অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক হয়েছে, কিন্তু যা আমাদের দেশে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত থেকে কী রাষ্ট্রনীতিতে কী সমাজব্যবহারে মারাত্মক সংঘাত রূপ ধরেছে, তার চলাচলের কোনো চিহ্ন সদরে বা অন্দরে আমাদের ঘরে কোনোখানে ছিল না। এ কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, জন্মকাল থেকে আমার, যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটেনি। তার রূপকারকে আপন নবীন সৃষ্টিকার্যে প্রাচীন অনুশাসনের উদ্যত তর্জনীর প্রতি সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য রাখতে হয় নি।'

২। 'আমাদের বাড়িতে আর একটি সমাবেশ হয়েছিল সেটি উল্লেখযোগ্য। উপনিষদের ভিতর দিয়ে প্রাক্ পৌরাণিক যুগের ভারতের সঙ্গে এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতি বাল্যকালেই, প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারনে অনর্গল আবৃত্তি করেছি

---

১. রবীন্দ্ররচনাবলী : দশম খন্ড,/ প্রবন্ধ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ/২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮ /প: ব: সরকার / পৃ. সং - ২১১/ ৬ নং প্রবন্ধ/ আত্মপরিচয়/

২. তদেব /৫ নং প্রবন্ধ/ পৃ.২০৮/

উপনিষদের শ্লোক। এর থেকে বুঝতে পারা যাবে, সাধারণত বাংলাদেশে ধর্মসাধনায় ভাবাবেগের যে উদ্‌বেলতা আছে আমাদের বাড়িতে তা প্রবেশ করেনি। পিতৃদেবের প্রবর্তিত উপাসনা ছিল শান্ত সমাহিত।'

৩। 'ঈশোপনিষদের প্রথম যে মন্ত্রে পিতৃদেব দীক্ষা পেয়েছিলেন সেই মন্ত্রটি বার বার নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে, বারবার নিজেকে বলেছি : তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ। আনন্দ করো তাই নিয়ে যা তোমার কাছে সহজে এসেছে, যা রয়েছে - তোমার চারিদিকে তারই মধ্যে চিরন্তন, লোভ কোরো না।'

৪। 'যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি -

"তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব অন্ধকারে।

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন - সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।'

৫। 'একবার পিতা আসিলেন। আমাদের তিনজনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্ত-বাগীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সংকলন করিয়া লইলেন। অনেকদিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারামবাবু প্রত্যহ আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আবৃত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল।'

---

৩. তদেব / ৫ নং প্রবন্ধ / পৃ. সং - ২৯৬ /

৪. তদেব / জীবনস্মৃতি / হিমালয় যাত্রা / পৃ. সং - ৪৪ /

৫. জীবনস্মৃতি / পৃ.৩৬ / আত্মপরিচয় /

৬। "সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা-অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া, উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।"

রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনীমূলক রচনা 'জীবনস্মৃতি' ও 'আত্মপরিচয়' থেকে উদ্ধৃত অংশগুলি অনুধাবন করলে অরূপানুভূতির উৎস সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়া যাবে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মলগ্নে যে পারিবারিক আবহাওয়া পেয়েছিলেন তার অন্যতম উপাদান হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ যা উপনিষদের মন্ত্র দিয়ে বিধৃত ছিল। ফলত: ছেলেবেলা থেকেই তিনি উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষালাভ করেছিলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে ও রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পরবর্তীকালে তিনি শান্তিনিকেতনে স্থায়ীভাবে বাস করবার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানে তিনি গড়ে তোলেন একটি আশ্রমিক পরিবেশ এবং প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ব্রহ্মমন্দির। এই আশ্রমেরই এক প্রান্তে অবস্থিত ছাতিমতলায় কবির বাল্যকালে তাঁর পিতা উপাসনা করেছিলেন। এই ছাতিমতলাও প্রেদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মমন্দিরে রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত উপাসনা করেছেন। এবং সেই সূত্রে তিনি যেসব রচনা লিখেছেন তার মধ্যে কবির আধ্যাত্মিক চেতনা বা অরূপানুভূতির পরিচয় রয়ে গেছে। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তার 'রবীন্দ্রসরণী' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে শান্তিনিকেতনের এই আশ্রমিক পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথের এই আধ্যাত্মিকচেতনা বা অরূপানুভূতি, বিকাশ লাভ করেছিল। অধ্যাপক বিশীর এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয় কেননা দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের বেশীর ভাগ গান, যা তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনার নিদর্শন, শান্তিনিকেতনের এই আশ্রমিক পরিবেশে রচিত। অর্থাৎ জন্মলগ্নে যে পারিবারিক পরিবেশ আধ্যাত্মিক চেতনার অঙ্কুর রূপে তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল তা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট আশ্রমিক পরিবেশে বিকাশ লাভ করেছিল। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই পরিবেশ

---

৬. তদেব / হিমালয় যাত্রা / পৃ.সং ৪৬ /

~~শুধু এই পরিবেশ~~ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর একটি পরিবেশে একটানা অনেকদিন ছিলেন। সেই পরিবেশ হচ্ছে উত্তরবঙ্গের পদ্মাবিধৌত অঞ্চল। রবীন্দ্রনাথ সাধারনতঃ পদ্মার উপর হাউসবোটে একাকী থাকতেন। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত চিঠিতে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা অনেকবার ব্যক্ত করেছেন। তবু একথা বলা অসঙ্গত হবে না যে শান্তিনিকেতনই ছিল রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির লীলানিকেতন। চারিদিকে ধূ ধূ করা শূন্য মাঠ, যাথার উপর নক্ষত্র রচিত অসীম আকাশ যদি রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতিকে পরিপুষ্ট করে থাকে তাহলে তা স্বাভাবিকই হয়েছে।

বস্তুত, সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির উৎস ও পারিপার্শ্বিকতা। এবং এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র অরূপানুভূতিমূলক রচনা।

খ) <u>ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা :</u>

আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক আছে অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে ধর্মনৈতিক আদর্শের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি সক্রিয় থাকে। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা অরূপানুভূতি এক বিশিষ্ট আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর ধর্ম সম্পর্কে নানা জায়গায় আলোচনা করেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ধর্ম', 'The Religion of Man', 'Region of an Artist', 'মানুষের ধর্ম' এবং আত্মপরিচয় গ্রন্থের ৬ সংখ্যক প্রবন্ধ। এ বিষয়ে তাঁর প্রাসঙ্গিক কিছু মন্তব্য উদ্ধৃত করছি।

৭। 'আমার ধর্ম কী, তা যে আজও আমি সম্পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট করে জানি, এমন কথা বলতে পারি নে - অনুশাসন আকারে তত্ত্ব আকারে কোনো পুঁথিতে লেখা

---

৭. তদেব / ৩ নং প্রবন্ধ / পৃ. সং-২০৩/

ধর্ম সে তো নয়। সেই ধর্মকে জীবনের মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব - কিন্তু অলস শান্তি ও সৌন্দর্যরস ভোগ যে সেই ধর্মের প্রধান লক্ষ্য বা উপাদান নয়, একথা নিশ্চয়ই জানি। আমি স্বীকার করি আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি - কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করে, তাকে ত্যাগ করে নয়, তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।"

৮. 'আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্মতত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর এক দিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর এক দিকে মিলন, এক দিকে বন্ধন আর এক দিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে, যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহন করে, যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যানকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও একেকে পূজা করে।'

৯. 'কিন্তু পূর্বেই বলেছি, যেটা বাইরে থেকে দেখা যায় সেটা আমার সাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেই সাধারণ পরিচয়েই লোকসমাজে আমার ধর্মগত পরিচয়। সেটা যেন আমার মাথার উপরকার পাগড়ি। কিন্তু যেটা আমার মাথার ভিতরকার মগজ, যেটা অদৃশ্য, যে পরিচয়টি আমার অন্তর্যামীর কাছে ব্যক্ত, হঠাৎ বাইরে

---

৮. তদেব /৩ নং প্রবন্ধ / পৃ. সং- ২০৫/

৯. তদেব /৩ নং প্রবন্ধ / পৃ. সং-১৮৬/

থেকে যদি বলে, তার উপরকার প্রানময় রহস্যের আবরণ ফুটো হয়ে সেটা বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি তার উপাদান বিশ্লেষণ করে তাকে যদি বিশেষ একটা শ্রেণীর মধ্যে বন্ধ করে দেয়, তা হলে চমকে উঠতে হয়।'

এর পাশাপাশি নিজের এর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কিছু অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। 'The Religion of Man' - গ্রন্থে তিনি বলেছেন তাঁর ধর্ম হচ্ছে Humanism বা মানবধর্ম। অন্যত্র, 'Religion of An Artist' - গ্রন্থে বলেছেন, 'My Religion is essentially a poet's Religion.'

ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নটি আপাতদৃষ্টিতে যতই সহজ, সরল মনে হোক না কেন প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি আদৌ তা নয়। বাহ্যতঃ আমরা প্রত্যেক মানুষকে এক একটি ধর্মীয় আদর্শের দ্বারা চিহ্নিত করে বলি - ইনি হিন্দু, উনি বৌদ্ধ, তিনি খ্রীষ্টান - ইত্যাদি। যখন আমরা একজন ব্যক্তিকে তার ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত করি তখন আমরা প্রকৃতপক্ষে এক একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখেই এসব কথা বলি। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা হয়তো বলতে পারি যে পারিবারিক সূত্রে এবং সাম্প্রদায়িক সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম। যদি আমরা রবীন্দ্রনাথকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ব্রাহ্ম হিসেবে দেখি তাহলে হয়তো সেই দেখা বাহ্যত অসংগত হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম তাঁর বাহ্যিক পরিচয় বহন করে মাত্র তা তাঁর যথার্থ পরিচয় নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার ধর্মাদর্শ কে নিষ্ঠার সঙ্গে আবাল্য অনুসরণ করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মের মতো মন্দিরে উপাসনাও করেছেন দীর্ঘকাল ধরে। 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের রচনাগুলির বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাঁর বেশির ভাগ অংশ উপনিষদের আলোকে আলোকিত। - যে উপনিষদ ব্রাহ্ম-ধর্মাদর্শের ভিত্তি স্বরূপ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে কিছু আলোচনা অযৌক্তিক হবে না বলেই মনে হয়। উনিশ শতকে যখন নবযুগের সূচনায় একের পর এক সামাজিক আন্দোলন হয়ে চলেছিল তার লক্ষ্য ছিল হিন্দুসমাজ ও ধর্মাদর্শ। কৌলিণ্য-প্রথা, সহমরণ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ, ইত্যাদি প্রথার বিরুদ্ধে তখনকার ইয়ংবেঙ্গল তথা শিক্ষিত সমাজ উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে নানা কদাচার ও অনাচারে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের আদর্শে তখনকার সমাজপতিরা যে বিধান জারি করতেন তা ছিল সর্বতোভাবে অনাচার ও নৃশংসতার নামান্তর। যে কোন অর্থে হিন্দুধর্ম হয়ে পড়েছিল বিকৃত আচার অনুষ্ঠানের আশ্রয়স্থল। এরই প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু সমাজের এক অংশ হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যদি খ্রীশ্চান মিশনারীদের দোষী সাব্যস্থ করতে হয় তবে তার চেয়ে অনেক বেশি দোষে দুষ্ট ছিল তখনকার কুলপতিরা। খ্রীষ্টধর্মকে সেইসময়ে নানা ভাবে নিন্দিত করা হতো কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দনীয় ছিল হিন্দু সমাজের নিয়ম-কানুন। কারণ সেই নিয়ম কানুনের কবলে পড়ে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অতিষ্ঠ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে শত শত অসহায় নারীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। মিথ্যা প্রলোভনে অসংখ্য শিশুকে গঙ্গা-সাগরে ছুঁড়ে ফেলা হতো। সবচেয়ে মারাত্মক ছিল কৌলিন্য প্রথা। কুলীন ব্রাহ্মনরা কয়েক ডজন স্ত্রীর স্বামী হয়ে থাকতেন এবং এই বিবাহ অটুট থাকতো মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত, অতঃপর সেই কুলীন প্রবরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেইসব হতভাগিনীর জীবনাবসান ঘটতো চিতার আগুনে। এমনি নানা বিকৃত অমানবিক নিষ্ঠুর আচারে হিন্দুধর্ম তখন প্রকৃতপক্ষে চরম অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। বিকৃত হিন্দু ধর্মের এবং অনাচার, ব্যাভিচারে পরিপূর্ণ হিন্দু সমাজের এই জঘন্য অবস্থার সুযোগ নিয়েই খ্রীশ্চান মিশনারীরা যদি হিন্দু ধর্মকে ঘৃণ্য মনে করে মানুষকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহনের আহ্বান জানিয়ে থাকেন তাহলে দোষ দেওয়া উচিৎ নয়।

বস্তুত, হিন্দুধর্মের এই বিকৃত অবস্থার কথা লক্ষ্য করেই তখনকার শিক্ষিত সমাজ হিন্দুধর্মের সংস্কারের কথা ভেবেছিলেন। এই ধর্মীয় সংস্কারের প্রচেষ্টা থেকেই ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব হয়। রামমোহন ছিলেন এর উদ্যোক্তা। যা পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্মকে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। এ বিষয়ে রামমোহনের আদর্শ ও পন্থা নানাদিক থেকে ছিল মূল্যবান ও অর্থবহ। উপনিষদের আদর্শে তিনি ব্রাহ্মধর্মকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমি পৌত্তলিকতা। রামমোহন তার বিরোধিতা করে উপনিষদের আদর্শ অনুসরণে বললেন, 'ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। এবং তিনি নিরাকার'। রামমোহন আরো বললেন এই ঈশ্বর ও ব্রহ্মের সাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেই গৃহী ব্যক্তি ঈশ্বরের উপাসনা করার অধিকারী। হিন্দুধর্মের সমস্ত বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান বর্জন করে অনেকটা গীর্জার অনুসরনে ব্রাহ্মমন্দির গড়ে উঠল। যে মন্দিরে কোনো মূর্তি রইল না, শুধুমাত্র সেখানে উপনিষদের মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ব্রহ্মের উপাসনা করার প্রথা গড়ে উঠলো। রামমোহন এইভাবে তমসাচ্ছন্ন ও তামসিকতাপূর্ণ হিন্দুধর্মের সংস্কারের প্রয়োজনে উপনিষদিক নিরাকার ব্রহ্মের আদর্শ সামনে রেখে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য উনিশ শতকের সামাজিক পটভূমিতে বিকৃত হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতিক্রিয়া রূপে এই ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের অভ্যুত্থান ছিল একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই ব্রাহ্ম পরিবারেরই সন্তান। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে তাদের উপাসনা গৃহ। রবীন্দ্রনাথ আশৈশব এই উপাসনাগৃহে উপস্থিত থেকে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ শুনেছেন, পিতৃদেবের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিয়েছেন, পরবর্তীকালে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন পরিণত হয়েছেন তখনো তিনি ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা করেছেন। কখনো কখনো আচার্যের আসনে উপবেশনও করেছেন। এ হেন রবীন্দ্রনাথ

কিন্তু নিজেকে কখনো ব্রাহ্ম হিসেবে চিহ্নিত করতে চান নি। তাঁর ধর্ম কী ? এ নিয়ে তখনকার দিনে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে সেইসব তর্কবিতর্কের উত্তরও তিনি দিয়েছেন। এবং তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে তাঁর ধর্ম কোনো বাহ্যিক আচারের বা সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানের দ্বারা পরিবৃত নয়। তাঁর ধর্ম হচ্ছে সেই মানবধর্ম। যে ধর্ম সমস্ত মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়।

প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায় জীবনের একটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে। সেই লক্ষ্য হচ্ছে উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উপলব্ধি বা তাঁর সান্নিধ্য লাভ অথবা মুক্তিলাভ। ঈশ্বরের উপলব্ধি বা মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর যে মানব-ধর্মের কথা বলেছেন সে ধর্ম কিন্তু ঈশ্বরকে বাদ নিয়ে নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ধর্মকে মানবধর্ম বা কবির ধর্ম যাই আখ্যা দিয়ে থাকুন না কেন আসলে তা ঈশ্বর বিহীন কোন ধর্মাদর্শ নয়। একথা ঠিক তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মের মতন কখনো আচরন করেন নি, আবার একথাও অস্বীকার করা যায় না যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ যাই হোক না কেন তা ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নয় সেই ঈশ্বর যিনি নিরাকার।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার নামান্তর হিসেবে আমরা যে অরূপানু-ভূতির কথা বলি সেই অরূপানুভূতি প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট ধর্মাদর্শ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের যে অনুভূতি তা আসলে নিরাকার জ্যোর্তিময় সত্তার অনুভূতি। এই concept থেকেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অরূপের অনুভূতি বা Concept গড়ে উঠেছে।

এই নিরাকার ব্রহ্মের আদর্শ সমন্বিত অনুভূতি থেকেই অরূপানুভূতিসূচক গান, কবিতা ও নাটক ইত্যাদি রচনার জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যে।

৩। ঈশ্বর বা অরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনা

উপনিষদে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে ব্রহ্ম - পরমব্রহ্ম। বলা হয়েছে তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং একমাত্র তিনিই সত্য। এবং তার প্রকাশ সমগ্র বিশ্বে সব কিছুর মধ্যেই তিনি বিরাজমান কিন্তু তিনি নিরাকার। ঈশ্বর সম্পর্কে উপনিষদিক ধারনার এই হচ্ছে সারমর্ম। ঈশ্বরের গুণ হিসেবে সাধারনতঃ বলা হয় তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। সেই কারনেই উপনিষদ বলেছে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য।

যেহেতু এই উপনিষদিক প্রত্যয়কে আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকচেতনা গড়ে উঠেছে সেই জন্যই তিনি ঈশ্বরকে নিরাকার রূপে দেখে এসেছেন। ঈশ্বরের এই নিরাকার সত্তাকেই তিনি অরূপ বলে অভিহিত করেছেন। এবং তাঁর আধ্যাত্মিক ভাবনা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারনার এই হচ্ছে মূল কথা।

আসলে ঈশ্বর কী, কে, ও কেমন এই প্রশ্ন বহু পুরোনো। সব ধর্মেই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে এবং তাঁর রূপটিকে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। দার্শনিকরাও প্রাচীন কাল থেকে এই আলোচনায় অংশ নিয়ে এসেছেন। ঈশ্বরকে এই পৃথিবী তথা অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে কল্পনা করে তাঁর সম্পর্কে দার্শনিকরা যেসব প্রশ্ন তুলেছেন তার মূল কথাও এই। কিন্তু শুধুমাত্র দার্শনিকই নয় হয়তো বা সব মানুষের মধ্যেই এই প্রশ্ন দেখা দেয়। সাধারনতঃ দেখা যায় যে মানুষ ঈশ্বরের অপ্রাপনীয় দূরবর্তী স্বর্গীয় একটি রূপ কল্পনা করে তার একটি মূর্তি গড়ে নিয়ে তার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে। আবার কখনো ঈশ্বরকে কোনো একটি মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর ভজনা করে। ব্রাহ্মরা ঈশ্বরকে সম্বোধন করে পিতা রূপে। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক

চেতনায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব কীভাবে দেখা দিয়েছে এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ঈশ্বর বা অরূপ কিভাবে দেখা দিয়েছেন বা ধরা দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত কবিতায় আছে, নাটকেও আছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে আছে তাঁর গানে - পূজা পর্যায়ের গানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অসংখ্য গানে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন এবং দেখা যায় তিনি ঈশ্বরকে নানাভাবে সম্বোধন করেছেন। এইসব সম্বোধন সূচক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনার যথার্থরূপে উপলব্ধি করা যায়।

গীতবিতানে সংকলিত পূজা পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৬১৭। বলা বাহুল্য - এইসব গানের বেশির ভাগই, বা ঠিকমতন বলতে গেলে - প্রায় সব গুলিই যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কীভাবে তিনি ঈশ্বরকে সম্বোধন করেছেন বা দেখেছেন তার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেল :

১. তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,

২. অরূপ তোমার বাণী অঙ্গে আমার চিত্তে
আমার মুক্তি দিক সে আনি॥

৩. আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে॥

৪. দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে

৫. প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।

৬. মোর হৃদয়ের গোপন বিজন সরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ণ - 'পরে -
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥

৭. রুদ্ধদ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতক্ষন এমনি কাটিবে স্বামী

৮. প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে ॥

৯. তুমি বন্ধু তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার

১০. আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার

১১. যিনি সকল কাজের কাজী মোরা তাঁরি কাজের সঙ্গী।

১২. হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ

১৩. যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙেঁ তুমি এসো মোর প্রাণে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥

১৪. তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।

১৫. ভুবনেশ্বর হে,
মোচন কর' বন্ধন সব মোচন কর' হে ॥

১৬. প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই।

১৭. তুমি এ-পার ও-পার কর কে গো ওগো খেয়ার মেয়ে ?

১৮. হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে।
এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর।।

১৯. প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামী, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর, দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।।

২০. নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে, ওগো অন্তরযামী,

২১. ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করেছে নিঠুর।।

২২. ও নিঠুর আরো কি বাণ তোমার তূণে আছে ?

২৩. এই করেছ ভালো, নিঠুর হে, নিঠুর হে, এই করেছ ভালো।

২৪. আনন্দ তুমি স্বামি, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহাসুন্দর, জীবননাথ।।

২৫. তুমি জানো, ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।।

২৬. ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।

২৭. রাখো রাখো রে জীবনে জীবনবল্লভে,

২৮. বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় ।

২৯. যদি ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই চঞ্চল-অন্তর
তবে দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে, দয়া কোরো হে ঈশ্বর।।

৩০. তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা ব'লে যেন জানি,

৩১. শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে -

৩২. হৃদয়বেদনা বহিয়া, প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়স্বামী, সকলই জানিছ হে -

৩৩. হে সখা, মম হৃদয়ে রহো।

৩৪. চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।

৩৫. স্বামী, তুমি এসো আজ অন্ধকার হৃদয়মাঝ -

৩৬. সংশয়-তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে ॥

৩৭. নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম
কত - না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে ॥

৩৮. শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা - প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,

৩৯. একি করুণা করুণাময় !

৪০. ভক্ত-হৃদি বিকাশ প্রাণ বিমোহন
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্ত গগনে হৃদীশ্বর॥

৪১. জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ -

৪২. ওহে জীবনবল্লভ, ওহে সাধনদুর্লভ,

৪৩. ... তবে পরাণপ্রিয়, দিয়ো হে দিয়ো বেদনা নব নব

৪৪. কী ভয় অভয়ধামে, তুমি মহারাজা - ভয় যায় তব নামে॥

৪৫. হে নিখিল ভার ধারণ বিশ্ববিধাতা,

৪৬. মহারাজ, এ কি সাজে এলে হৃদয়পুরমাঝে!

৪৭. কে গো অন্তরতর সে !

৪৮. এই যে তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ,

৪৯. ওহে সুন্দর, মরি মরি,
তোমায় কী দিয়ে বরণ করি ॥

৫০. এ কি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে,

৫১. মধুর রূপে বিরাজ হে বিশ্বরাজ,

৫২. সে যে মনের মানুষ, কেন তারে বসিয়ে নয়ন দ্বারে ?

৫৩. আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে,
তাই হেরি তায় সকল খানে ॥

৫৪. পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,

৫৫. ওগো, পথের সাথী নমি বারম্বার।

৫৬. কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস -
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল ওগো, ধরায় আস ॥

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে যে রূপে সম্বোধন করেছেন তাকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১। ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক : তুমি, বন্ধু, সখা, স্বামী, প্রিয়তম, প্রিয়, প্রেয়িক, চিরসখা, পিতা।

২। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে আরাধ্য হিসেবে : গুণী, অরূপ, প্রভু, নাথ, দেবতা, রাজা, মহারাজ, মহারাজা।

৩। বিশেষনাত্মক ভাবদ্যোতক মূর্তিরূপে : প্রানেশ, করুনাময়, চিরসুন্দর, ভুবনেশ্বর, অন্তরযামী, জীবননাথ, জীবনবল্লভ, জীবনস্বামী, প্রাণেশ্বর, দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, হৃদীশ্বর, বিশ্বরাজ, সুন্দর, জগপতি বিশ্ববিধাতা, নিখিলভারধারণ, হৃদয়স্বামী, হৃদয়বরণ, মনের মানুষ, পরাণপ্রিয়, সাধনদুর্লভ, অন্তরতর, প্রেমময়, জ্যোর্তিময়, প্রাণের মানুষ, পথের সাথী, পান্থ জনের সখা।

৪। প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন : ঈশ্বর

বৈচিত্রের দিক্ থেকে যদিও এই চারটি শ্রেণীতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সূচক সম্বোধন গুলিকে ভাগ করা হয়েছে। আসলে প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক সম্বোধনগুলি মুখ্য, অন্যান্য পর্যায় গুলি তার অনুসঙ্গী মাত্র। অন্যদিকে একটি গানে ঈশ্বরকে সরাসরি ঈশ্বর রূপেই অভিহিত করা হয়েছে।

এখন উপরোক্ত তথ্যগুলি সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের উপলব্ধি কীভাবে করেছেন বা ঈশ্বরকে কী চোখে দেখেছেন তার আলোচনা করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা প্রকারান্তরে দার্শনিক আলোচনার পর্যায়ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা

করতে গিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বা সমালোচক এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা স্বভাবতই প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ঈশ্বরের স্বরূপ কিভাবে বিধৃত হয়েছে। সাধারণভাবে মানুষ যাকে ঈশ্বর বা God বলে থাকে সেই ঈশ্বরের স্বরূপই বা কী, এ প্রশ্ন তারা রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। সেইসব আলোচনার বিবরণ দেওয়ার দরকার নেই এখানে, শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা গেল।

দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে সরাসরি 'তুমি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই 'তুমি' কে ? কখনো এই 'তুমি'কে তিনি বলেছেন বন্ধু, বলেছেন সখা, বলেছেন স্বামী, ইত্যাদি। এই সম্পর্কগুলি একান্তভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভিব্যক্তি - যেমন করে আমরা আমাদের জীবনে আত্মীয় ও প্রিয়জনকে সম্বোধন করে থাকি অর্থাৎ বলতে পারা যায় এই সব সম্বোধনের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের রূপটি রবীন্দ্রনাথ দাঁড় করাতে চেয়েছেন তা হচ্ছে এই যে ঈশ্বর তাঁর ঘনিষ্ট আপনজন, পরমআত্মীয় অথবা আত্মার আত্মীয় এবং এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছেন, তাঁর অস্তিত্বের উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অনুভবে ঈশ্বর 'তুমি' রূপে কি নিবিড়ভাবে রূপায়িত হয়েছে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। এই 'তুমি' সম্বোধনের ভেতর দিয়ে যে কী ভাবে ঈশ্বরের সত্তাকে প্রাণস্পন্দনে বিজড়িত করে নিয়েছেন তার সেইসব রচনার ভিতর দিয়ে মনে মনে অনুভব করা যায়। যেমন :

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে -
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥

শুধু তাই নয় এর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি ছবি :

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর -
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥

এই হচ্ছে ঈশ্বর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির মূলকথা। ঈশ্বর নিজে আসেন, কবির কাছে, সেই অসীম ঈশ্বর নিজে আসেন, কবির কাছে, সেই অসীম ঈশ্বর সীমার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেন। এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন তাঁর জীবনে একটি ব্যক্তি-গত সম্পর্ক স্থাপন করে ঈশ্বরের লীলা বা মহিমা উপলব্ধি করেছেন অন্যদিকে তেমনি একটি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে 'প্রভু' রূপে, স্বামী রূপে ঈশ্বরের ধ্যান করেছেন। আবার এ-ও লক্ষ্য করা দরকার, একদিকে যিনি বন্ধু, সখা, জীবনস্বামী, প্রাণেশ, প্রভু আবার অন্যদিকে তিনিই বিশ্ববিধাতা, বিশ্বরাজ, করুনাময়, জগপতি। অর্থাৎ ব্যক্তি-গত জীবন থেকে বহু দূরবর্তী একসত্তা। কিন্তু 'তিনি' অরূপ। অর্থাৎ নিরাকার; তাঁকে ব্যক্তি-সম্পর্কের মধ্যে জড়িত করা গেলেও তিনি রূপহীন অর্থাৎ অরূপ। 'রাজা' নাটকে দেখি রাণী সুদর্শনা রাজাকে বাহ্যিকরূপে দেখার জন্য ব্যাকুল। রাজা তাঁকে বলেন যে তুমি আমায় কোনো বিশেষরূপে দেখতে চেয়ো না। স্বভাবতই রাজার এই উত্তর তাঁকে খুশী করে না। তিনি বার বার শারীররূপে অর্থাৎ একটি বিশেষ মূর্তিতে রাজাকে দেখা দিতে বলেন। শেষ পর্যন্ত - দেখা যায়, অনেকটা কালিদাসের পার্বতীর মতো দুঃশ্চর তপস্যা ও প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে রাণী সুদর্শনা রাজার দর্শন পেলেন অন্ধকারে। অন্ধকারে মিলন হলো তাঁদের। কিন্তু এ মিলন কেমন মিলন ? অন্ধকারে রাজাকে সুদর্শনা কীভাবে দেখলেন ? কোন চোখে দেখলেন ? বলা বাহুল্য, সুদর্শনা রাজাকে দেখলেন বাহ্যিক রূপে নয়, তাঁকে অনুভব করলেন অন্তরের গভীরে। বাস্তবিক পক্ষে, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের উপলব্ধির অভিজ্ঞান হিসেবে রাজা নাটকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকের ভেতর দিয়ে সুদর্শনার ও রাজার পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চান ঈশ্বরকে কোনো বাহ্যিক রূপে পাওয়া যায় না বা ধরা যায় না। তাঁর উপলব্ধি আসলে একান্তভাবেই অন্তর নির্ভর। একটি সত্যের উপলব্ধি। এই নাটকেও রবীন্দ্রনাথ আসলে ঈশ্বরের 'অরূপ' সত্তাই তুলে ধরেছেন।

এই বিশ্লেষণ থেকে রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির হয়তো কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেল। এই সূত্রে আর একটি বিশেষ সমস্যা বা প্রসঙ্গের উল্লেখ করা দরকার। সেই সমস্যাটি হচ্ছে রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদেবতা প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে অজিত চক্রবর্তী সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন। তারপরে এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আরো অনেক আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল :

১০. "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্তৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন - সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

এরই পাশাপাশি অনুরূপ আরো দুটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন যে তাঁর মধ্যে আর একজন 'রচনাকারী' আছেন যিনি তাঁকে দিয়ে সবকিছু করিয়ে নিচ্ছেন। আবার এক জায়গায় 'আমি এবং আমার অন্তঃপুরবাসী আত্মা'র কথা বলেছেন - সে দুইজনে মিলে হাউসবোটের ঘরটি অধিকার করে থাকতো। দেখা যাচ্ছে, 'জীবনদেবতা', 'রচনাকারী', এবং 'অন্তঃপুরবাসী আত্মা' এই তিনটি সত্তার কথা বলে রবীন্দ্রনাথ নিজের মধ্যেই একটি দ্বৈতসত্তার কথা কল্পনা করেছেন। অজিত চক্রবর্তী জীবনদেবতার আলোচনায় বলেছেন যে জীবনদেবতা আসলে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাঁকে

---

১০. তদেব / আত্মপরিচয় / পৃ. সং - ১৭০ / ১ নং প্রবন্ধ /

ঠিক ঈশ্বর রূপে দেখা সঙ্গত হবে না। অন্য দুটি সত্ত্বা অর্থাৎ 'রচনাকারী' ও 'অন্তঃপুরবাসী আত্মা' সম্পর্কেও হয়তো একই কথা বলা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'জীবনদেবতা' যদি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে জড়িত হন এবং তিনি যদি কবির সবকিছু কারক হন তাহলে তিনি যে অরূপের কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি বারম্বার 'তুমি' হিসেবে সম্বোধন করেছেন সেই অরূপ তাহলে কে ? এবং তাঁর কৃত্যই বা কী ? আমাদের ধারণা, এই প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল। রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির আলোচনায় এই প্রসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য দেশে 'মিষ্টিক কবি' বলা হয়েছে তার মূলে আছে আলোচ্য প্রসঙ্গ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির প্রশ্ন। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অনেকাংশে দায়ী এবং তার মূলে আছে ঈশ্বরের বা অরূপের সঙ্গে জীবনদেবতার সম্পর্কের প্রশ্ন। রবীন্দ্র পাঠকের কাছে এই প্রশ্ন বা সমস্যা এখনো পর্যন্ত একটা সমস্যা থেকে গেছে বলে মনে হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'The Philosophy of Ravindranath Tagore'- গ্রন্থে ঈশ্বর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারনা কী সে বিষয়ে বিস্তৃত এবং মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তিনি অবশ্য তাঁর আলোচনার উপাদান হিসেবে মূলত নির্ভর করেছেন ইংরেজী গীতাঞ্জলি এবং Sadhana গ্রন্থের উপর। রাধাকৃষ্ণনের এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই। তাঁর তিনটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

ক) He gives us a human 'god', ... (P.3)

খ) If from the poems of (P.34, Ch VII) 'Gitanjali' we infer that God is a person over against man, we make a mistake. To Rabindranath God is not a being seated high up in the heavens, but a spirit immanent in the whole universe of persons and things.

গ) Isvara, the highest manifestation of the 'Absolute', in the personal Lord of the universe. The distinction of the lover and the loved is kept up till the last point, when in perfect love the two become one. The personal god is then dissolved in the Absolute. If Rabindranath is viewed as a worshipper of a personal god, he may be looked upon as the living example of the long and noble succession of the religious devotees. of whole India is justly proved. ...(P. 36, VII)

ড: রাধাকৃষ্ণনের এই ব্যাখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে, আমরা যাঁকে ইষ্টদেবতা বলি, তিনি সেই ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথের 'Personal god' বলেছেন। কিন্তু এই 'Personal God' শেষ পর্যন্ত মিশে যান 'Absolute' এর মধ্যে। ড: রাধাকৃষ্ণন আরো বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের এই ধারনা আসলে একান্তভাবেই ভারতীয় - এবং তার ধারা আমাদের। একশ্রেণীর সাধকদের অধ্যাত্ম-সাধনার মধ্যেই রয়ে গেছে। রামানুজ, কবীর, দাদু, চৈতন্য, তুলসীদাসের আধ্যাত্মিক চেতনায় আমরা এই ধারটির পরিচয় পাই। অর্থাৎ ড: রাধাকৃষ্ণণ প্রকারান্তরে দেখাতে চেয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতি। একান্তভাবেই ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার অর্ন্তভুক্ত।

ঘ) <u>রবীন্দ্রকাব্যে প্রকাশিত অরূপানুভূতির নির্বাচিত দৃষ্টান্ত :</u>

এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যে আলোচনা করা গেল সেই আলোচনা সামনে রেখে এবার সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কীভাবে তার প্রকাশ

ঘটেছে তার একটি নির্বাচিত তালিকা এবং আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া গেল :

রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ থেকে 'অনুভূতি' সংক্রান্ত কিছু নির্বাচিত কবিতার তালিকা :

সোনারতরী

সোনার তরী

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দুধারে -
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

নিরুদ্দেশ যাত্রা

আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে
হে সুন্দরী ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
সোনারতরী।

চিত্রা

অন্তর্যামী

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে

বলিতে দিতেছ কই।
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।

জীবনদেবতা

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আমি অন্তরে মম।
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।
কত যে বরন কত যে গন্ধ
কত যে রাগিনী কত যে ছন্দ
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসরশয়ন তব -
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ফণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্যনব।

নৈবেদ্য

প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

কটি জোড়কর, হে ভুবনেশ্বর,
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে -
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

(১ সংখ্যক কবিতা)

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার
বন্ধ রহে গো প্রভু
দ্বার ভেঙেঁ তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

(৫ সংখ্যক কবিতা)

না বুঝেও আমি বুঝেছি তোমারে
কেমনে কিছু না জানি।
অর্থের শেষ পাই না, তবুও
বুঝেছি তোমার বাণী।

(৯ সংখ্যক কবিতা)

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু -
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

(১৪ সংখ্যক কবিতা)

প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর,
তুমি মোরে দাও সুর।
তুমি যদি থাক মনে
বিকচ কমলাসনে,
তুমি যদি কর প্রাণ
তব প্রেমে পরিপূর -
প্রতিদিন তব গাথা
গাব আমি সুমধুর।

(১৯ সংখ্যক কবিতা)

যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
নাহি চাহি নাথ।

(৪৫ সংখ্যক কবিতা)

খেয়া

মিলন

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো - আমার
জুড়ালো হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
পরান কি নিধি কুড়ালো - ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।

খেয়া

তুমি এ পার - ও পার কর কে গো,
ওগো খেয়ার মেয়ে !
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে,
ওগো খেয়ার মেয়ে !
ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার মেয়ে !

গীতাঞ্জলি

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
(১ সংখ্যক)

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু,
এবার এ জীবনে
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
(২৪ সংখ্যক)

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে,
দেখা নাই পাই,
পথ চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।
ধূলাতে বসিয়া দ্বারে
ভিখারি হৃদয় হা রে
তোমারি করুনা মাগে।
কৃপা নাই পাই,
শুধু চাই,
সেও মনে ভালো লাগে।

(২৮ সংখ্যক)

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই - যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ - 'পরে,
এই-যে বাতাস দেহে করে
অমৃত ক্ষরণ।
এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়ভরণ।

(৩০ সংখ্যক

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।

ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে
সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে,
শ্রবণ আমার গভীর সুরে
হয়েছে মগন।
তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার
বাজাই আমি বাঁশি।
গানে গানে গেঁথে বেড়াই
প্রাণের কান্নাহাসি।
এখন সময়ে হয়েছে কি।
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি
জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব
এ মোর নিবেদন।

(৪৪ সংখ্যক)

আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।

(৪৬ সংখ্যক)

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয় রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার,

সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে,
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।
চিরদিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে,
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি।

(৪৭ সংখ্যক)

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুনাধারায় এসো।
সকল মাধুরী শুকায়ে যায়,
গীত সুধারসে এসো।

(৫৮ সংখ্যক)

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে -
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে -
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

(৬৫ সংখ্যক)

ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা
প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।

যায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

(৭৯ সংখ্যক)

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয় পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

(১২০ সংখ্যক)

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে -
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

(১২১ সংখ্যক)

একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।

(১৪৮ সংখ্যক)

গীতিমাল্য

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।

(৫২ সংখ্যক)

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবনমরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে।

(১০৪ সংখ্যক)

গীতালি

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক না হারা।
জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবনব্যেপে জাগুক হরষ,

তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা।

(১৪ সংখ্যক)

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে ?
এই যে আলো সূর্যে গ্রহে তারায়
ঝরে পড়ে শত লক্ষ ধারায়
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

(৪৫ সংখ্যক)

বলাকা

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি।

(২৭ সংখ্যক)

আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।

(২৯ সংখ্যক)

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে -
সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।

তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

(৩৩ সংখ্যক)

পরিশেষ

আহ্বান

আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক
সে কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেলো 'ভালোবাসো'-
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

শেষপ্রশ্ন

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি - সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।

শেষলেখা

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বের করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ।
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।

(১৫ সংখ্যক)

৬) রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির পর্যালোচনা

এখন অরূপানুভূতির ব্যাপারটি পূর্বাপরতা সূত্রে পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। যদি আমরা এই আলোচনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাই তাহলে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের এই অরূপানুভূতি ধীরে ধীরে বিকশিত হতে হতে চরম প্রকাশ লাভ করেছে গীতাঞ্জলি পর্বে। যথাক্রমে গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতিকার মধ্যে। তবে গীতাঞ্জলিই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতির সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান। এক অর্থে বলা যায়, বনফুল থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্বের ভিতর দিয়ে একটি ধারা সমাপ্ত হয়েছে গীতাঞ্জলি পর্বে। তারপরে বলাকা থেকে শুরু হলো আর একটি ধারা। এখান থেকে

রবীন্দ্রকাব্য বাঁক নিয়েছে আর এক পথে। গীতাঞ্জলিকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের বা তাঁর কাব্য দর্শনের চরম প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা'ই তাঁর কাব্যের মূল কথা। গীতাঞ্জলির মধ্যে এই সীমা ও অসীমের মিলন সাধন হয়েছে একথা আমরা জেনেছি। এদিক থেকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও জীবনের বাসনা চরিতার্থ হয়েছে গীতাঞ্জলিতে। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি এই অরূপানুভূতির রেশ বলাকা কাব্য থেকে ক্ষীন হতে শুরু করেছে। বলাকায় অরূপানুভূতির কিছু দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু তারপরেই বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় রবীন্দ্রকাব্যের এই পর্যায়ের কবিতা ক্রমশঃ কমে গেছে। এবং শেষ পর্যন্ত গভীরতর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য শেষ হয়েছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে যার মধ্যে অরূপানুভূতির কোনো স্পর্শ নেই। বলাকা উত্তর রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যধারা সেখানে তার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ যেন মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছেন এবং জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। এর মধ্যে অরূপানুভূতির কোনো স্থান নেই। 'প্রান্তিক', 'সেঁজুতি', 'জন্মদিনে', 'রোগ-শয্যায়', 'আরোগ্য' প্রভৃতি কাব্যে রবীন্দ্রনাথের একটা আধ্যাত্মিক বা spritual চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও তা প্রকৃতপক্ষে আগেকার অরূপানুভূতি নয়। গীতাঞ্জলিতে যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা অরূপানুভূতিতে প্রগাঢ় ভাবে মগ্ন হতে দেখি সেই রবীন্দ্রনাথকে শেষ পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

সবশেষে একটা কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথের এই অরূপানুভূতির তাৎপর্য কী এবং সার্থকতা কোথায় ? এর উত্তরে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের অরূপানুভূতি আসলে তাঁর দার্শনিক উপলব্ধি বা জীবনদর্শনেরই অভিব্যক্তি। আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের এই অরূপানুভূতির ভিত্তি হচ্ছে - উপনিষদ। উপনিষদ বলেছে - যা কিছু আমরা

দেখছি তা হচ্ছে অমৃতের আনন্দময় রূপ। অর্থাৎ জীবনের সব কিছুই আনন্দময়, তাই অর্থময় : 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যতো হোক অবহেলা। অর্থাৎ জীবনের প্রতি একটা স্থির পরম বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেছেন। ফলে, জীবন হয়েছে তাঁর কাছে অর্থময়, আনন্দময়।

বস্তুত, রবীন্দ্রসাহিত্যে জীবনের প্রতি যে একটি বিশ্বাসের ছবি আমরা ক্ষনে ক্ষনে দেখতে পাই, তার মূলে আছে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্পর্কে এই বিশিষ্ট প্রত্যয়, তাঁর অরূপানুভূতিই এই faith বা বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

২। The Philosophy of Tagore / ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ